মাহমুদুল হক সিরিজ ২

কৃষ্ণপক্ষ

বারোমাসি বইন্ত

১

সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে ধুনধুমার অনুষ্ঠান শেষে কমিউনিটি সেন্টার ছেড়ে যাচ্ছিলেন কমপক্ষে আটশত মেহমান। নববিবাহিত জুটি বসে পড়েছিলেন ফুলেল নীলরঙা প্রাইভেট কারে, গেটে জমছিলো ধামাকা। টেবিলের সারি, কিচেন, সাউন্ড সিস্টেমে গানবাজনা, লাইটিং, ক্যামেরাম্যানের ঝামেলাগুলো সেরে রাখছিলো নাফিস-পাপ্পুরা। পার্টি কনেপক্ষের মুরুব্বীদের সাথে লেনদেনের বচসা সেরে রাখছিলেন মাহমুদুল হক। সমস্ত শংকা ভুল প্রমাণ করে মোটামুটি লাভ তুলেই শেষ করা সম্ভব হয়েছিলো নারায়ণগঞ্জের এই বিয়ের প্রোগ্রাম।

সপ্তাহখানেক আগে একটা ব্যস্ততম ঝামেলাপূর্ণ পর্যায় গিয়েছিলো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বাংগাউ এন্টারপ্রাইজের, যার পরিচালক ছিলেন মাহমুদুল হক, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা। অবসর গ্রহণের পর চলে গিয়েছিলো এক বছর, এর মধ্যে এই ব্যবসার হাত দিয়ে নিরন্তন প্রচেষ্টায় ছিলেন কীভাবে মার্কেটে টিকে থাকা যায়। আজ কমিউনিটি সেন্টার-এর এই বিয়ের প্রোগামটার পরপরই অপেক্ষা করছিলো আরেকটি অনুরূপ অনুষ্ঠান, ময়মনসিংহে। তারপরই এক জটিল অপারেশন কক্সবাজারে সমুদ্র ভ্রমণের এক প্রোগ্রামের আয়োজন, জনৈক ব্যবসায়ীর সাথে বিদেশী পার্টনারের আলোচনা। ঐ প্রোগ্রামের জন্য মানসিক প্রস্তুতি যাতে ঠিক থাকে, সেজন্য ইভেন্ট টিমের ছেলেপেলেদের বেশ খানিকটা ছাড় দিয়ে রেখেছিলেন তিনি। এসব ছোটখাটো বিয়ের অনুষ্ঠান কীভাবে কী করতে হবে, যেসব নিয়ে চাপাচাপি করেননি।

রাত্র এগারোটায় অজানা নম্বর থেকে এসেছিল কল, ব্যস্ততায় পাত্তা দেননি। ততক্ষণে অনুষ্ঠানও শেষ হয়ে এসেছিল, মাহমুদ সাহেবের সামনে চলে এল টিমের সদস্য রানা। ক্লান্তিতে চোখে কালি, চুল এলোমেলো।

"স্যার, আজকে মালপত্র টানার সময় আর এনার্জি কিছুই নেই। কমিডিনিটি সেন্টারের ম্যনেজারকে বলে দিয়েন। আজকে চলে যাই, কাল সকালে সব নিয়ে যাবো। রাতে তো এদের আর কোন প্রোগ্রাম নেই, মালপত্র থাকলে ক্ষতি কী?"

"ঠিক আছে, তবে কাউকে পাহারায় থাকতে হবে। যাকেই রাখো, আগামীকাল তার ছুটি।"

"তাহলে তো টিমের প্রত্যেকেই পাহারায় থেকে যাবে," হেসে ফেললো রানা, তবে ক্লান্তিতে হাসিটা ফ্যাকাসে ছিল।

সকলে যার যার ঘরে ফিরে গেলে, মাহমুদ সাহেবও ফিরলেন লালমাটিয়ার ভাড়া বাসায়। গেটে বসে বসে এই রাতেও জেগে ছিলো গার্ড ফখরুল, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে চিবুচ্ছিলো পান। তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠে রাতে খাবার শক্তিও ছিল না, কোনরকমে গোসলটা সেরে ঘুমাতে গেলেন। ঘুমের মাঝে কোন কোন সময় যে দুঃস্বপ্নটা দেখতেন, সেটি বারবার ঘুরে ঘুরে আসতে চাচ্ছিল। অচেতনভাবে তা নিতে চাচ্ছিলো না ঘুমকাতুরে

মস্তিষ্ক, বারবার স্বপ্নের গতি থামিয়ে অন্য কিছু একটা দেখাচ্ছিল। একবার রৌদ্রালোকিত বাগান, একবার সমুদ্রের পিছনে সূর্যাস্ত। শেষ পর্যন্ত ঐ দুঃস্বপ্নটা ফিরে এসেছিলো কিনা তাও বলতে পারেননি তিনি।

***

পরদিন সকাল আটটা থেকে বাংগাউ এন্টারপ্রাইজ-এর অফিসে বসে গেলেন তিনি। এদেশের কাজকর্ম সকাল নয়টার আগে শুরু হয় না, এটা একটা নেতিবাচক অভ্যাস। বিদেশে এত দেরিতে অফিস খুলে না। বাকিরা কখনোই নয়টার আগে আসবে না, তা ধরে নিয়েই একমনে কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। আয়কর, পার্টিদের আর ডাটাবেজের তালিকা, বাজেট হিসাব।

নয়টার পর টিমের সকলে এসে গেলো, রওনক বসে পড়লো ডেস্কে। আরম্ভ করলো ডাটাবেজের কাজ। বাকিরা বসে পড়লো মিটিং রুমে।

“কী, এরফানের বাবার ওখানে গিয়েছিলে?” প্রশ্ন করলেন মাহমুদ সাহেব।

“জি, স্যার, অমায়িক মানুষ,” হেসে নিলো রওনক। “ডিনার করালেন, এরফানের সাথে টানা চব্বিশ রাউন্ড দাবা খেলতে গিয়ে রীতিমত রাত দশটা। উনি পরে দুই হাজার টাকাও দিলেন, যদিও তার স্ত্রী আমার আগমনে তেমন খুশি হননি।”

“স্বাভাবিক। ধরেই নিলেন, দাবার খেলার অজুহাতে নতুন প্রেম জুটিয়েছেন এরফানের বাবা,” কাঁধ ঝাঁকালেন মাহমুদ সাহেব। “যাক, তোমাকে পেমেন্ট দিলেন তাহলে, গুডলাক। প্রতিষ্ঠানের সুনামটা থাকলো, যেকোন পার্টির ডাকে দ্রুত সাড়া দেই আমরা, এমন একটা ইমেজ দাঁড়াচ্ছে। এটাই বড় কথা। তুমি বসে বসে এই ডাটাবেজের কাজ করতে থাকো, আমি বাকিদের সাথে বসি।”

মিটিং রুমে সবাই উপস্থিত ছিলো, যারা অসুস্থ ছিলো, তারাও। মাহমুদ সাহেব এসেই নির্দেশনা দিয়ে গেলেন।

“নাফিস, দু’জনকে নিয়ে ফের চলে যাও নারায়নগঞ্জ। কমিউিনিটি সেন্টারের মধ্যে রয়ে যাওয়া আমাদের মালপত্র মাইক্রোতে করে নাও। এগুলো পাহারা দিতে রয়ে গেছে সোহাগ। সোহাগকে জানাও, আজ তার ছুটি। মালপত্র নিয়ে রওনা দাও ময়মনসিংহ, এই যে কমিউিনিটি সেন্টারের ঠিকানা, আর এই যে গ্যাসের টাকা। ময়মনসিংহে হুবহু একই রকম বিবাহ অনুষ্ঠান আজ বিকাল থেকে, কোন দেরি নয়, খাওয়াদাওয়া দৌড়ের উপর করবে। ওখানে পৌঁছে কল দিবে, আমি বাকিদের পাঠাবো। কিন্তু আমি এবার যাচ্ছি না, কামরুল সাহেবের সাথে সমুদ্রযাত্রার ব্যাপারে মিটিং আছে। আমার সাথে রয়ে যাচ্ছে রানা। ময়মনসিংহ প্রোগ্রামের নেতৃত্বে নাফিস, রানা ছাড়া সবাইকে পাবে।”

২

পরদিন ছিলো বেশ শীত, কুয়াশাও ঝেঁকে ছিলো ভালোভাবে। কমপক্ষে সপ্তাহের জন্য ব্যাগ গুছিয়ে উত্তরা চলে এলেন মাহমুদ সাহেব, ঠিকানা দেখে পৌঁছে গেলেন 'আলতাফ ভিলা'। দেয়ালঘেরা বাগানের মাঝে কোনরকমে উঁকি দিচ্ছিলো পুরোনো সবুজ বর্ণের ছাদ। চারদিকে ছিলো নীরব, এদিকে ঘরবাড়ি ছিলো কম, শূন্য প্লটের সংখ্যা প্রচুর। গাড়িঘোড়া তো একদমই দেখা যায়নি।

মাহমুদ সাহেব মরিয়মকে কল দিলেন, ওপারের কণ্ঠকে মনে হলো বেশ ভীত, "মাহমুদ সাহেব, এসে গেছেন?"

"হুম, এলাম তো।"

"একটু দাঁড়ান প্লিজ, গেট খুলে দিচ্ছি।"

আরো মিনিটখানেক কুয়াশার মাঝে বিশাল গেটের সামনে অপেক্ষা করলেন, কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগলো। অদ্ভুত নীরব ছিলো চারপাশ। বিকট শব্দ করলো গেট, দেখা গেলো মলিন চাদরে মাথা ঢেকে থাকা মরিয়মকে। বেশ করুণ চোখে তাকালো সে, আসতে ইঙ্গিত করলো।

ভিতরে এসে ধূলিধূসর বাগানের মাঝে শুকনো পাতার শব্দ তুলে হেঁটে গেলেন। বাগানের ভেতরে বেশ প্যাঁচানো পথের শেষে দেখা গেলো সদর দরজা। ভারি, পুরাতন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলো পনেরো বয়সী কিশোর, উষ্কো চুল, কুটিল দৃষ্টি। মাহমুদ সাহেবকে দেখে সালাম দিয়ে সরে দাঁড়ালো। তারা প্রবেশ করলো বিস্তীর্ণ বসার ঘরে, মাহমুদ সাহেব সোফায় বসে ব্যাগ রাখলেন।

"বাবা আসছেন, বসুন," মরিয়ম ছেলেটাকে নিয়ে দ্রুত পর্দার পিছনে উধাও হয়ে গেল।

মাহমুদ সাহেব বসে ছিলেন একা, চারদিক দেখে নিলেন। সবকিছু ছিমছাম, সাজানো, কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তিকর নীরব, নির্জীব। জানালার বাইরে বাড়ছিলো গুমোট অন্ধ কুয়াশার সকাল, বাড়ির ভিতরটা ছিলো প্রচণ্ড শীতল। কেন যেন দূরের কোন ঘর থেকে অস্পষ্ট কান্নার শব্দ আসছিলো। বেশ সময় ধরে কেউ আসছিলো না দেখে শোকেস-এর পাশের বুক শেলফ থেকে একটা রসায়নের বই খুঁজে নিলেন। দুই একটা পাতা উল্টাতেই পর্দা নড়ে উঠলো, হাজির হলেন সবুজ পাঞ্জাবি আর ধূসর প্যান্ট পরা দরাজ এক ভদ্রলোক, প্রথম দেখায় ষাটের দিকে বয়স মনে হবে। ঘন ভুরুর নিচে কিশোরের মতই কুটিল জোড়া চোখ একনজর মাহমুদ সাহেবকে দেখে নিলো।

হঠাৎই দুই হাত বাড়িয়ে চাওড়া হাসি দিলেন।

"আসসালামু আলাইকুম, মাহমুদুল হক সাহেব! আমি আলতাফ হোসেন।"

"ওয়ালাইকুমুস সালাম," মৃদু হেসে উষ্ণ কর্মদন করলেন মাহমুদ সাহেব।

"সাত সকালে চলে এলেন, স্বাগত। আমরা অনেক শুনেছি আপনার কথা, যশোরের জসিমউদ্দিন সাহেবকে চিনেন তো? উনার বন্ধু আমি, একসময় যশোরে আমিও থাকতাম। আপনি নাকি কুষ্টিয়ার রেঞ্জে ছিলেন দারোগা পদে?"

"জি," মাহমুদ সাহেব খুঁটিয়ে আলতাফ সাহেবের মুখ ভঙ্গি লক্ষ্য করছিলেন।

"আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি খামাখা, চলুন চা খাই, আসুন," বিশালবপু আলতাফ সাহেব ইঙ্গিত করলেন আসার জন্য, "জসিমউদ্দিন বলেছেন আসবেন। তার সাথে নিশ্চয়ই আপনার অনেক কথা জমা আছে।"

তারা প্রবেশ করলেন মাঝারি আকারের খাবার ঘরে, এখানে টেবিলে বসে ছিলেন আলতাফ সাহেবের পরিবার। আলতাফ সাহেবের স্ত্রী, বেশ লম্বা, পাটকাঠির মত সরু, শুকনো মুখ। ছিলো সেই কিশোর ছেলে, মরিয়ম আর আরেক তরুণী, ডাগর গভীর চোখে মেহমানকে দেখে নিলো।

"এই যে, আমাদের সাথে মাহমুদ সাহেব চলে এসেছেন," বললেন আলতাফ সাহেব। "পরিচয় হোন, আমার স্ত্রী, দুই মেয়ে মরিয়ম আর লুবনা, ছেলে জনি।" সবাইকে সালাম দিয়ে হাসিমুখে টেবিলে বসে পড়লেন মাহমুদ সাহেব।

টেবিলে চা ইতোমধ্যে দেওয়া ছিলো, কিন্তু হঠাৎ আলতাফ সাহেব স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, "চা ঠান্ডা হয়ে গেছে, ফেলে দাও তো। নতুন করে বানাও।"

মিসেস আলতাফ দ্রুত উঠে গিয়ে সবুজ কাপগুলোর ট্রে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। যেন চোখের আড়াল হতে পেরে খুশি হয়েছেন।

মিনিট পাঁচেক পর টেবিল গরম চা ছিলো, এবার কাপগুলো সাদা বর্ণের। সঙ্গে নাস্তা পরিবেশন করলেন মিসেস আলতাফ, যেখানে স্বয়ং কর্তা অনবরত কথা বলে যাচ্ছিলেন। জানালেন, যশোরে কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে চাকুরি করতেন, এই বাড়ি বানানো হয়েছে অনেক বছর আগে। ঐ সময় এই এলাকায় শূন্য প্লট ছাড়া কিছু ছিলো না, একাকী শান্তিতে ভালোই ছিলেন। মেয়েরা কিছুটা একঘেয়েমিতে ভোগে বটে।

আলতাফ সাহেবের একনাগাড় কথার তোড়ে কেবল শুনে যাচ্ছিরেন মাহমুদ সাহেব, প্রচণ্ড শীতে গায়ে কোট টানলেন। সকলের কাছ থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছিল একটা জিজ্ঞাসু অপেক্ষা, যার কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। স্পষ্টত টেনশনে ছিলেন মিসেস আলতাফ, এটাও কারণ ছিলো অস্পষ্ট।

"মরিয়ম, লুবনা, উনার ঘরটা রেডি করে দিও," বললেন আলতাফ সাহেব। "প্লিজ সংকোচ করবেন না, নাস্তা করুন।"

"আপনার মেয়েরা পড়াশোনা করছেন?" বললেন মাহমুদ সাহেব।

"হ্যাঁ, প্রাইভেট ভার্সিটিতে। বিয়েশাদি নিয়ে তাড়াহুড়া করছি না। ওরা একদম দেখতে আমাদের মত হয়নি, সব দূরের আত্মীয়দের চেহারা পেয়েছে। তবে আমাদের মাঝে বন্ধনটা খুব দৃঢ়, তাই না?"

“শাহরিয়ার সাহেব, আমি আপনার কেস দেখবো, আমি রাকিব। শীঘ্রই জামিন হবে।”

***

সকাল আটটা থেকে অফিসে বসে নিজে নিজেই কফি বানিয়ে খেলেন মাহমুদুল হক। দেখা গেলো, তাঁর আগেভাগে শুরু করার অভ্যাসটা অন্তত রানা আর রওনক রপ্ত করা শুরু করেছে, তারাও চলে এসেছে আটটার পর।

মাহমুদুল সাহেব বলেন, “সবাইকে ডাকো, মিটিং আছে। আমার বন্ধু ফয়সাল সাহেবের মেয়ে, খুশি’র বিয়ে হবে গাজীপুরে। বিভিন্ন রকম আইডিয়া নিয়ে বসতে হবে। সকালের নাশতা না করে থাকলে দ্রুত করে ফেলো, আমরা এমনিতেই এখন থেকে আটটায় শুরু করার প্র্যাকটিস করতে চাচ্ছি। রওনক, নুপুর কি মরিয়মকে বাসায় নিয়েছে?”

“হ্যাঁ। মরিয়ম আপু একটু ভয়ে ভয়ে আছে, তবে ঠিক হয়ে যাবে, স্যার। নুপুরের তিন বোন, সামলে নিবে।”

“ঠিক আছে, এমনিতেই শিরিন এসে তাকে নিয়ে যাবে, চিন্তা নেই। এখন আপাতত ডাটাবেজ নিয়ে বসো। রানা, তুমি আমার সাথে বসো। দেখে, স্পটের মানচিত্র জোগাড় করলাম, কোথায় কী করা সম্ভব, ভাবতে থাকো।”

মাহমুদ সাহেব আর রানা কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে চলে আসে বাকিরা। ততক্ষণে পৌনে নয়টা সকাল, সবাইকে নিয়ে মিটিং রুমে চলে গেলেন তিনি। সঙ্গে রওনককেও ডাকলেন।

“কী কী রকমারি ধাঁধা টাইপের খেলা করা যায়, তার কমপক্ষে ডজনখানেক আইডিয়া আজকের মধ্যে বের করতে হবে। পার্টির প্ল্যান, জলখাবারের ফাঁকে ফাঁকে নানান কুয়েষ্ট অ্যাডভেঞ্চার টাইপের খেলা হবে, তারপর আবার খানাপিনা এবং পুরোটা সময় চলবে মিউজিক। খাবার সময় নম্র ভদ্র, আর খেলাধুলার সময় দ্রুত লয়ের। সাধারণ সাউন্ড সিস্টেম দিয়ে সেটা করলেই হয়, কিন্তু না, লাইভ ব্যান্ড চাই। আবার অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় স্পটের উপর দিয়ে চক্রাকারে উড়তে থাকবে গ্যাস বেলুনের অ্যারোষ্ট্যাট, ওটাতে একজন চড়বে, ছিটাবে ফুল আর রঙিন কাগজ টুকরো। ভদ্রলোকের একেক আইডিয়া শুনলে আক্কেলগুড়ুম হবার জোগাড়। এখন এধরনের আর কী কী হতে পারে, এবং কোনটাতে কার কী ভূমিকা থাকবে এটা নিয়ে সবাইক ভাবতে হবে।”

শুনানি চললো দুপুর একটা পর্যন্ত। কোন যুক্তি কাজে দেয়নি, মাহমুদ সাহেব আর সাইফুলের দেওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণকে অসার অযৌক্তিক আর অতিপ্রাকৃত বলে অভিহিত করলেন বিচারক। জলজ্যান্ত মানুষ শাহরিয়ার, সে আবার কীভাবে দানবীয় বৈশিষ্ট্য রাখবে? পাগলের প্রলাপ। আঙ্গুলের ছাপ মিলে না, ভিকটিমের পরিবার আসামী চিনে না। ১৯৪৪ আর ১৯৮৪ সালের বাহাস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ফাজলামী নাকি? এক গরীব সার্ভিস কর্মীকে অযথা পুলিশি হয়রানি করা হচ্ছে, যতসব! এমনিতেই পুলিশের যা ইমেজ, তা কি আরও ডুবাতে চাচ্ছেন? আর অবসরপ্রাপ্ত দারোগা ইভেন্ট কোম্পানী পরিচালক মাহমুদুল হক কোন অধিকারে নিজ ঘরে শাহরিয়ারকে আটকে রাখেন, মারধর করেন? মগের মুল্লুক? সাবেক পুলিশ দারোগার ক্ষমতার দাপট? উল্টো মাহমুদুল হকের নামেই মামলা হওয়া উচিত, তবে কোর্ট আপাতত উনাকে সাবধান করে দিয়ে, এখানেই শুনানি ইস্তফা দিচ্ছেন। শাহরিয়ার জামিনে বের হয়ে আইনজীবী রাকিব সাহেবের তত্ত্বাবধানে কোন সামাজিক সংগঠনের আশ্রয়ে থাকবে। এই হলো কোর্টের রায়। আর সিটি কর্পোরেশন পুনরায় তাকে সার্ভিসে নিবে, ব্যস।

আদালত থেকে বের হয়ে করিডোরে দাঁড়ালেন অসন্তুষ্ট মাহমুদ সাহেব, পাশে সাইফুল। আইনজীবী আর পুলিশদের সাথে হেঁটে গেলো শাহরিয়ার, মাহমুদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি দিলো। দূর থেকে চড় দেখালো এসআই সাইফুল।

“থাক, বাদ দেন,” বললেন মাহমুদ সাহেব। “ওর উপর নজর থাকবে আমাদের, কোথায় যায়, কী করে। আঙ্গুলের ছাপ কেন মিললো না বলেন তো?”

“জানা কথা, হাতের ছাপ নেবার সময় আঙ্গুলের চামড়া টেনে লম্বা করেছে,” নাক দিয়ে শব্দ করলেন সাইফুল। “আর হাসনাত সাহেবকেও অন্য চেহারা দেখালো। গাল, কপাল আর থুতনির চামড়া বদলালো। মনটা চায় ট্রাক চাপা দিয়ে মেরে ফেলি।”

“বাদ দেন। চলেন যাই, অফিসে কাজ পড়ে আছে। তবে ওর গতিবিধির জন্য দু’জন লোক পিছনে লাগিয়ে রাখুন।”

দুপুরের পরে অফিসে ফিরে এসেই ফয়সাল মাহমুদের কল পেলেন মাহমুদুল হক।

“ডিরেক্টর সাব, তোমার আইডিয়ার প্লানগুলো মেইলে পেলাম। সুন্দর সব আইডিয়া, সবগুলোতেই আমার সায় আছে। এখন একদিনে এতকিছু কীভাবে করা যাবে? গাজীপুরে মেহমানরা পৌঁছাতে পৌঁছাতেই তো দুপুর।”

“সেক্ষেত্রে দুটোর যেকোনো একটা কাজ করতে হবে। হয় সবাইকে জানাতে হবে, কষ্ট করে ভোরে রওনা দিতে, তাহলে সকাল থেকে রাত ননষ্টপ প্রোগ্রাম চলবে। অথবা দু’দিনের প্রোগ্রাম, তাহলে স্পটে রাত থাকার তাঁবু লাগবে।”

“আটশত মেহমান, মাহমুদ, সবার জন্য তাঁবু?”

“সবার জন্যই। প্রয়োজনে শিশুদের আলাদা, মহিলাদের আলাদা, কোন পরিবার আলাদা প্রাইভেসি নিয়ে থাকবে না। কোন না কোন একদিক থেকে

১

ভোর সকালে বেশ কষ্ট করেই জেগে উঠেছিলো *বাংগাউ এন্টারপ্রাইজ*-এর টিমের সব ছেলেমেয়ে। গতকাল শেষ হয়ে এসেছিলো দুইদিনব্যাপী বিশাল বিবাহ অনুষ্ঠান, গাজীপুরের গহীনের মাঝে ছিলো ভেন্যু। কনের বাবা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার ফয়সাল মাহমুদ ইচ্ছা করেই কোনরূপ গেস্টহাউস বা প্রখ্যাত পিকনিক স্পট নিতে চাননি, ভরসা রেখেছিলেন ইভেন্ট টিমের পরিচালক মাহমুদুল হক সাহেবের উপর। বিশ্বাস ছিলো, সবচেয়ে দুর্গম স্থানেও জমকালো অনুষ্ঠান সংঘটিত করার ক্ষমতা রাখে বাংগাউ এন্টারপ্রাইজ। ফয়সাল সাহেবের এ আশা ফিরিয়ে দেননি মাহমুদুল হক, ঠিকই সবকিছু সুন্দরভাবে সাজাতে পারলেন। দুই দিন ধরে ব্যাপক মিউজিক ব্যান্ড আর ধাঁধা সম্বলিত খেলাধুলার আয়োজন করতে গলদঘর্ম হয়েছিলো টিম, সবার ঘুম হারাম।

তবে সবকিছুর পরও দিনশেষে অনুষ্ঠান সফল হলো। মাহমুদ সাহেবের মেয়ে শিরিনও কনে খুশির আদিকালের বান্ধবী থাকায়, সর্বক্ষণ পাশে ছিলো। তবে সন্তানের দিকে তাকানোর মত অবস্থা ছিলো না মাহমুদ সাহেবের, তিনি দুই দিন টানা ব্যস্ত ছিলেন টিমকে নিয়ে। আজ সকাল থেকে সবকিছু গোছানোর পালা, মেহমানদের বিদায় নেবার পালা। সকাল আটটায় পুরো টিমকে জাগালেন মাহমুদ সাহেব, একসাথে বসালেন।

“ছোট্ট বন্ধুরা, আজকে খবর আছে। নাস্তা করে ফেলো আর চটজলদি মেহমানদের বিদায়ের জন্য যা যা লাগে, ব্যবস্থা করো। আমি ফয়সাল সাহেবের সাথে বসছি। এরপর মেহমানরা চলে গেলে প্রথমেই তাঁবু সরাবে। রানা, বাবুর্চি ও তাদের টিমকে পেমেন্টের খাম দাও, আর এই খামে দুই ব্যান্ডের পেমেন্ট। রওনক আর নুপুর, খেলাধুলার আইটেম গুছিয়ে ট্রাকে তোলো। পাপ্পু, সোহাগ, পলাশ, জুফফাত, বিয়ের প্যান্ডেল ডেকোরেশন গোছাবে। নাফিস, বৈদ্যুতিক সমস্ত সরঞ্জাম গুটাও। সকাল দশটা নাগাদ সবকিছু ট্রাকে তোলা চাই। আমরা যেন দুপুরের লাঞ্চটা অলরেডি ঢাকার অফিসে করি। কারণ, অফিসে আজকে মিটিং।”

তিনি নিজেও হাই তুলতে তুলতে রওনা দিলেন মেহমানদের তাঁবুর সারির দিকে, যেখানে আড়মোড়া জেগে মাত্র মাত্র জেগে যাচ্ছিলেন ফয়সাল মাহমুদ সাহেবের পরিবার। চারদিকের বনাঞ্চলে তখনো কাটেনি কুয়াশা।

***

মিরপুর দশ নম্বরের অফিসে পৌঁছে সবাই একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, মাহমুদ সাহেব লাঞ্চ আনতে পাঠালেন নাফিস ও সোহাগকে, নিজে চলে গেলেন ডেস্কে, বসে গেলেন মোবাইল ফোন নিয়ে। পথে বেশ কিছু মিসড কল পেয়েছিলেন, কিন্তু কোষ্টারে বসে

একটু ঘুমিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। একটি মিসড কল ছিলো প্রতিষ্ঠানের মালিক এনায়েত সাহেবের, দু'টো ছিলো বিবাহ পার্টির। আরেকটি মিস কল সবচেয়ে অনাকাঙ্খিত, এসআই সাইফুলের। এই কলের অর্থ, পুনরায় উঁটকো ঝামেলা।

এবার, ডেস্কে বসে তিনি এক এক করে সবাইকে কল করতে লাগলেন। দুই পার্টিকে লাঞ্চের পরই অফিসে আসতে আহবান করলেন। এনায়েত সাহেব জানালেন, কাছে-পিঠেই ভালো জায়গা পাওয়া গিয়েছে অফিসের জন্য, মাহমুদ সাহেব চাইলে দেখে যেতে পারেন। মাহমুদ সাহেব জবাবে বললেন, বিকাল পাঁচটায় ঠিকানায় চলে আসবেন। কথা বলতে বলতে চোখের কোণায় দেখছিলেন, মিটিং রুমে শোরগাল; লাঞ্চের প্যাকেট বিতরণ করছিলো সোহাগ। বেচারা ছেলেপেলে সারা সকাল পরিশ্রম করে গাজীপুরে সব গোছালো, তারপর ক্লান্তিকর পথে ঢাকা এলো। এখন সবার রাক্ষুসে খিদা, যার পরই জরুরি মিটিং। আবার কী কঠিন চাপ দিয়ে দেন ডিরেক্টর স্যার, কে জানে!

ওদিকে একনজর দিয়ে মাহমুদ সাহেব কল দিলেন সাইফুলকে।

"গাজীপুর থেকে ঢাকা যাচ্ছিলো সবাই, গাড়িতে আর ফোন ধরিনি। সরি! বলুন, কী অবস্থা!"

"মাহমুদ সাহেব, কী আর বলবো বলেন," ওপার থেকে বললেন এসআই। "মাত্রই আগের কেসের ফাইল বন্ধ করলাম, আবার শুরু হলো। গুলশানে লাশ, মাঝবয়সী এক ব্যবসায়ী, নিজ ফ্ল্যাটেই। সম্ভবত ক্লাবে গিয়েছিলো, পরে রাতে নিজ বাসায় নষ্টামি করতে গিয়ে নিহত! খুনীদের মাঝে একজন মহিলা, ওরা হয় দু'জন, না হয় তিনজন ছিল। থানার লোকজন কিছুই ঠাওর করতে পারছে না।"

"আবার?" মাহমুদ সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "কোন ক্লু আছে?"

"আছে। রক্ত খেয়েছে সুঁই দিয়ে, হয় ইনজেকশন, না হয় মেডিকেল নিডল দিয়ে। ঠিকানা দিচ্ছি মেসেজে, প্লিজ সময় বলেন কখন আসতে পারবেন।"

"আজকে তো সারাদিন ব্যস্ত, তবে রাতেই আসতে হবে। আপনি থাকুন কিন্তু।

"ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আপনি আসছেন শুনেই ভরসা পেলাম।"

লাঞ্চের সময় হাজির হলেন দুই বিয়ে-পার্টি, একটি সাভার, আরেকটি রাজশাহীতে এবং এই বিয়ের তারিখ পড়ছে আগে। বাজেট নিয়ে বচসা চললো, কিন্তু ফাইনাল সিদ্ধান্তে আসা হয়নি। হাতে সময় ছিল না, মাহমুদ সাহেব তাদেরকে আশ্বাস দিলেন আগামীকাল কথা ফাইনাল। ততক্ষণ মিটিং রুমেও টিম তাদের লাঞ্চ শেষ করে একটু স্থিত হলো। পার্টিদের বিদায় দিয়ে মাহমুদ সাহেব চলে এলেন মিটিং রুমে, এখানে ইতোমধ্যে সবাই ছিলো প্রস্তুত। বেতনের খামগুলো বিলিয়ে দিলেন, হাত পিছনে নিয়ে পায়চারি করতে করতে বললেন, "গুণে নাও, এখানে নিয়মিত বেতন ছাড়াও প্রত্যেককে বারো হাজার করে বখশিশ দেয়া আছে। ফয়সাল সাহেবের বিয়ের ইভেন্ট

২

সকাল আটটায় বহাল তবিয়তে উপস্থিত হলেন অফিসে। রওনক এসে পড়লো সবার আগে, চুপচাপ বসে গেল ডাটাবেজের কাজে। মাহমুদ সাহেব প্রথমেই চেক করলেন মেইল, দেখে নিলেন একগাদা পাঠানো ফাইল। সেই সন্দেহভাজন মহিলার চেহারা, যা কিনা সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়লো। বেশ কম বয়সী, কড়া মেকাপ আর ঝাঁকড়া চুল। পুলিশের খাতায় কোন উল্লেখ নেই। রাজশাহী থেকে পাঠানো দুই কেসের ফাইল, দেখা গেলা একই মেডিকেল সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ভিকটিমের রক্ত খাওয়া হয়েছে। একজন ছিলেন স্কুলশিক্ষিকা স্নেহা রোজারিও, আরেকজন ব্যাংক কর্মকর্তা মাইকেল বাপ্পী মন্ডল। রাজশাহীর পুলিশের ভাষ্য, এখানেও সম্ভবত তিনজন বা দু'জন হত্যাকারী ছিলো, এবং উভয় কেসেই তাদের একজন মহিলা বলে স্পষ্ট আলামত ছিলো।

কেস দুটো সংঘটিত হবার দুই তারিখ দেখে কল করলেন সাইফুলকে।

"আপনার মেইল পেলাম। শুনেন, আজকে কেবল রাতে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারবো। এখানে বলা হচ্ছে, রাজশাহীর দুই হত্যাকান্ড হয়েছে দুই দিনের গ্যাপে, দুই মাস আগের কথা, এরপর আর খবর নেই। এবার ঢাকায় অনুরূপ কেস। হতে পারে দুদিন পর এখানে আরেকবার হবে। আপনি তো জানেন, সিরিয়াল খুনীরা প্রায়ই একটা প্যাটার্ন ফলো করে, এটা তদের একটা দুর্বলতা।"

"হুম।"

"তারা যে সিরিঞ্জ ব্যবহার করেছে, তা হাইপোডার্মিক নিডল, এগুলো ব্যবহার করা হয় ব্লাড ব্যাংকে। খুনীরা ওখান থেকেই তা নিয়েছে। সম্ভবত দুদিন পর তারা নিকটস্থ ব্লাড ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করতে যাবে। গুলশানের চারপশে যত ব্লাড ব্যাংক আছে, সেসব স্থানে খোঁজ করুন। দুই মাস আগে কোন নতুন কর্মচারী সেখানে চাকুরি নিয়েছে কিনা। দ্রুত জানান, সেখানে অভিযান করবো। কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিবেন।"

"জি, আমি খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি," সাইফুল ফোন কেটে দিলো।

ততক্ষণে চলে এলো রানাদের টিম, সবাইকে মিটিংরুমে ডাকলেন মাহমুদ সাহেব। রানা বাড়িয়ে দিলো সমস্ত প্রোগ্রামের শিডিউলের কাগজ, সেটা একনজর পড়লেন তিনি।

"দুদিন পর রাজশাহীর বিয়ে প্রোগ্রাম, তারপরই সিলেট রিসোর্ট কর্পোরেট পার্টি। আরো তিনদিন পর আবার গাজীপুর কনসার্ট। দৌড়ের উপর সবকিছু করতে যেন অসুবি না হয়, সেজন্য একটা লরি ট্রাক ভাড়া করা যাক। গুদামের সমস্ত সরঞ্জাম বাববার টানাটনি করতে সারাক্ষণ যাতায়াতের প্রস্তুতি। দায়িত্বে সোহাগ।"

"জি, স্যার," লম্বা কুঁজো সোহাগ মাথা ঝাঁকালো।

"পাপ্পু, আগের গাজীপুর গার্মেন্টস পার্টির কাছে আমরা এখনও বারো লাখ টাকা পাই। তাদেরকে ফোন করেছো, তারা কী বললো? চুক্তিপত্র তো সই করলাম।"

"স্যার, তারা সাফ জানিয়ে দিলো, অ্যাডভান্স চার লাখ দিয়েছিলো, আর দিতে পারবে না। অথচ ঐ অ্যাডভান্স প্রোগ্রমে খরচ হয়ে গিয়েছিলো, উপরন্তু আমাদের নিজের ফান্ডের দুই লাখ গেলো অতিরিক্ত। প্রোগ্রামে সবমিলিয়ে খরচ ছিলো ষোল লাখ, তো আমাদের নিট পেমেন্ট দুই লাখ মাত্র। যেহেতু ছয় লাখ পর্যন্ত আমরা ম্যানেজ করার পর আরো দশ লাখ লোন করে প্রোগ্রামে দিলাম, ঐ দশ ফেরত দিবো, দুই রাখবো, সব মিলিয়ে বারো লাখ আমরা পাই। ওরা আর দিতে রাজি না।"

"তারপর?"

"এনায়েত স্যারকে জানালাম, উনি সরাসরি প্লান্টে কথা বলতে বলেছেন। আমিই যাচ্ছি, স্যার। যদি তাদের ফাইনাল কথা হয়, তারা দিবে না, তাহলে আমরা আদালতে যাবো।"

"তুমি আজকেই গাজীপুর গিয়ে প্লান্টে কথা বলে আসবে, কারণ রাজশাহীতে বিয়ের প্রোগ্রামে তুমি নেতৃত্ব দিবে। সিলেট রিসোর্টের প্রোগ্রামের নেতৃত্বে নাফিস আর গাজীপুরের প্রোগ্রমের নেতৃত্বে রানা। যানবাহনের যাতায়াতের যা কিছু আছে, দেখবে সোহাগ। আচ্ছা, এরপর যে ঝামেলার অর্ডার, তাতে পাপ্পুকে আবার লাগবে, তুমি গ্যাঞ্জাম সামলাতে পারো। একটা কলেজে প্রোগ্রাম আছে। ভিসি স্যার অনুরোধ করেছেন সিনিয়র ছাত্রদের র‍্যাগিং ঠেকাতে হবে। জুনিয়ররা ভীত। বহিরাগত ছেলেপেলে এসে প্রোগ্রামের দিন জুনিয়রদের রক্ষা করবে। পুলিশ ডাকা যাবে না, কিছুদিন আগে ঐ কলেজে একটা ঝামেলায় পুলিশের উপর সকল ছাত্রদের ক্ষোভ আছে। পুলিশ দেখলেই তাড়া করবে। তাই আমাদের একই সাথে প্রোগ্রামও চালাতে হবে, আবার জুনিয়রদের পাহারা দিতে হবে।"

"স্যার, এটা করা যাবে না," বললো পাপ্পু। "বহিরাগত ছেলেরা নাক গলাচ্ছে, এটা দেখার সাথে সাথে গোট ক্যাম্পাসে ব্যাপক সংঘর্ষ আরম্ভ হবে। তখন প্রোগাম ভেস্তে যাবে। সিনিয়র ছাত্ররা সব সহ্য করবে, কিন্তু বহিরাগতদের খবরদারি নয়।"

মাহমুদ সাহেব পকেটে হাত দিয়ে জানালা দেখলেন, নাকে বাতাস টানলেন।

"তবে কি এই অর্ডার বাতিল করবো?"

"বাতিল করাই ভালো হবে, স্যার। ওসব সামলাতে হলে গুন্ডাপান্ডা কিসিমের ছেলেপেলে ক্যাম্পাসে নিয়ে আসতে হবে। আমার কাছে এসবের খোঁজ আছে, কিন্তু এ কাজে ওদের আনলে আমরাই সমস্যায় পড়বো। প্রোগ্রাম মাঝপথে বরবাদ হবে, পুরা লস খাবো।"

"ঠিক," মাহমুদ সাহেব মাথা চুলকালেন। "রানা, কলেজের অর্ডার বাতিল করো, কলেজে কল করে জানাও আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। পাপ্পু, এখনই রওনা দাও গাজীপুর, ডেস্কে দেখবে ঐদিনের কনসার্টের ফাইল, ওটা নিয়ে যাও সাথে। যাবার সময় এনায়েতুল্লাহ্‌ স্যারকে ইনফর্ম করো। সোহাগ, লরি ট্রাক ভাড়া করার কাজে যাও। নাফিস, এই যে সিলেটের কর্পোরেট পার্টির কন্টাক্ট, কল করে কথা বলো। রানা,

ছোট ছোট বিষয় পরস্পরের সাথে সম্পর্কহীন নানান কিসিমের সবকিছু দলা পাকিয়ে এই বইটিতে স্থান পেয়েছে। শেষ অংশের "যখন দুলেছিল পাতারা" গল্পটি আসলে এক সিএনসি চালকের মুখে শোনা। তার বাড়ি গাইবান্ধা।

কাযিব : পৃষ্ঠা ২০৭, মূল্য : ২৬০ টাকা

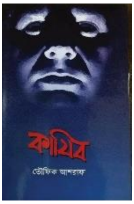

ক্ষমতার উদগ্র বাসনা একজন মানুষকে কতটা পরিবর্তন করে, বিবেকের অবশিষ্টাংশ কিভাবে ধুলিস্মাৎ করে, বানিয়ে ফেলে অমানুষ, তার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে এই উপন্যাস। তবে কেন জানি ইহজাগতিক শীর্ষ স্থান পাবার সকল চেষ্টা, যেখানে রক্তাক্ত পিচ্ছিল অন্ধকার পথের মাঝে দিশা হারিয়ে ফেলে একজন সাধারণ পদার্থ বিজ্ঞানী, শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। কেননা, নরকের কীটদের বিপরীতেই দাঁড়িয়ে যায় ন্যায় ও আলোর প্রহরীরা। চলে দুধর্ষ সংঘাত এবং ফলাফল অনিশ্চিত।

শুকনো পাতার শব্দ : পৃষ্ঠা ১৭৬, মুল্য : ৩৫০ টাকা

সমাজে একটা বিশেষ শ্রেণী আছে, যাদেরকে কেউ কেউ বলে ছাপোষা মধ্যবিত্ত। এরা স্বাভাবিক মধ্যবিত্তের মতো না। এদের জীবনে যেসব ঘটনা-অঘটন হয়, সেসব নিয়েই এই ছোট গল্পের ভলিউম বই। এসব কাহিনী ছাপোষাদেরই হয়, স্বাভাবিকদের না। এগুলোর মাঝে একটা গল্প সত্য ঘটনা অবলম্বনে। কোনটা, তা বলা যাবে না।

বিমুখ রংধনু : পৃষ্ঠা ৯৬, মুল্য : ২৫০ টাকা

আকাশে ছোট্ট কোনো পাখি নিজ খেয়ালমতো উড়ে বেড়াবার সময় হয়তো লক্ষ্যই করে না, মেঘের আড়াল থেকে বহুক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ্য করছে শিকারী কোন পাখি। পরিস্থিতির কারণে একা পড়ে যাওয়া এক কিশোরী জড়িয়ে পড়ে নানা অঘটনে, আর ক্রমেই অবস্থাটা চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে...